কার পাপে

অবনী সান্যালের কোর্সমেটরা বছরে একবার করে গেট টুগেদারে মিলিত হন। রাজধানী ও রাজধানীর আশেপাশে নতুন গড়ে ওঠা পশ্ কলোনির কোনও নামী দামী হোটেলে অথবা ক্লাবে। অবনী সান্যালের বত্রিশ জন কোর্সমেটের মধ্যে মাত্র তেরো জন কাছেপিঠে আছেন। কাছেপিঠে আছেন মানে গেট টুগেদারে আসার মত দূরত্বের মধ্যে বাস করেন। বাদ বাকিরা দেশের এবং দেশের বাইরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বত্রিশ জনের মধ্যে আবার ছ'সাত জন ইতিমধ্যে গত হয়েছেন। ছ'সাত কিংবা হয়তো আট-নয় কি দশও হতে পারে। সময় মত খবর পাওয়া যায় না সব সময়। প্রয়াতদের আত্মীয়েরা অনেকে গা করেন না। অনেকে সুযোগ সুবিধার অভাবে যোগাযোগ করে উঠতে পারেন না।

অবনী সান্যাল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন পনেরো বছর আগে। কোর্সমেটরা তাঁদের বয়স অনুযায়ী দু'এক বছর আগে পিছে রিটায়ার করেছেন। মোটা টাকা পেনসন পান সবাই। এ ছাড়া সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেবার পরও এটা-সেটা কোন না কোন উপায়ে রোজগারপাতি করেছেন অনেকেই। বেশ কয়েক বছর। সরকারি দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এঁরা সবাই। এত বছরের অভিজ্ঞতা ফেল্না নয়। ছোটখাট প্রাইভেট ফার্মে সহজেই চাকরি মেলে এদের। মাইনে খুব একটা আহামরি না হলেও পদে মানে সম্মানজনক চাকরি - ম্যানেজার, জেনেরাল ম্যানেজার, ডিরেক্টর, ভাইস প্রেসিডেন্ট ----। কমবয়সী লোক রাখতে যত খরচ অবসরপ্রাপ্তরা তার ঢের কমে কাজ করতে রাজী হয়ে যায়। পেনসনের উপর যা মাইনে পায় সেটাই লাভ। মালিক ও চাকুরে দু'পক্ষই খুশি।

অবনী সান্যালও পুরোপুরি অবসরপ্রাপ্ত নন। সরকারি চাকরি থেকে বেরিয়ে এসে কয়েক বছর নাসিকে ছিলেন। নাসিকেই তাঁর চাকরি জীবনের শেষতম পোস্টিং হয়েছিল। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী মমতার ভারী পছন্দ হয়েছিল জায়গাটা। ভাল একটা চাকরিও জুটে গেছিল। ইতিমধ্যে খবর এলো দিল্লীতে ডি.ডি.এ.'র নতুন ফ্ল্যাট বিলি হচ্ছে এবং লটারিতে যাদের নাম উঠেছে অবনী সান্যাল সেই ভাগ্যবানদের একজন। বহুদিন আগে হুজুগে পড়ে সহকর্মীদের সাথে দিল্লীর

ফ্ল্যাটের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছিলেন। শেষবয়সে অশক্ত দেহ-মন নিয়ে রাজধানী এলাকার ভিড়ভারাক্কায় জীবন কাটানোর কোন অভিপ্রায় তখন ছিল না তাঁদের। এখনও তাঁর কাছ থেকে উক্ত ফ্ল্যাটের মালিকানা চড়াদামে কেনার জন্য আগ্রহী প্রার্থীর অভাব হত না। কিন্তু অবনী সান্যাল সে পথে না গিয়ে নাসিকের বাস তুলে দিয়ে সস্ত্রীক দিল্লী চলে এলেন।

দিল্লীতে এসে সহমনস্ক কয়েকজনের সঙ্গে মিলে একটা কোচিং সেন্টার খুলেছেন পাড়ায়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অ্যাডমিশন প্রার্থী তিরিশ জন স্টুডেন্টকে ঝাড়া এক বছর ধরে গাইড করে দেশের সেরা সংস্থাগুলিতে ঢুকিয়ে দেন - আই.আই.টি, বিট্‌স্‌ আদি। এ-যাবৎ ওঁদের কোচিং সেন্টার থেকে কোন ছাএ বিফল হয়নি। ঢালাও রেকর্ড আছে এ তল্লাটে। অবনীর স্ত্রী মমতা স্কুলের ছেলেমেয়েদের অঙ্ক আর ইংরিজী শেখান। ছ'টি ছাত্র আছে তাঁর। ক্লাস ফাইভ থেকে এইট অবধি। সপ্তাহে পাঁচ দিন এক ঘণ্টা করে পড়ান। টিউটর হিসেবে মমতার সুনাম আছে। ওঁর ছাত্র-ছাত্রীরা বরাবর ভাল রেজাল্ট করে স্কুলে। ছ'জনেই।

অবনী ও মমতা পার্টি-ফার্টি বিশেষ পছন্দ করেন না। গত আট-দশ বছরে - যখন থেকে এই গেট টুগেদার চালু হয়েছে - একবারও যান নি তাঁরা। গেট টুগেদারের খরচখরচায় নিজেদের দেয় অংশটি চেক মারফৎ পাঠিয়ে দায়িত্ব চুকিয়েছেন। চেকের সঙ্গে চিঠিতে অনুপস্থিত থাকার জবরদস্ত কোন কারণ উল্লেখ করেছেন প্রতিবার: নিজেদের অসুস্থতা, নিকট আত্মীয় পরিজনদের জড়িয়ে জরুরী অবস্থা, পেশার কাজে কিংবা সামাজিক কর্তব্যসাধনে শহরান্তরে যাত্রা, হেনা-তেনা। এবার যাচ্ছেন তার কারণ সম্প্রতি কোচিং সেন্টারের কাজটা হস্তান্তরিত করে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অবনী। সরেও এসেছেন খানিকটা। আপাতত শুধু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর। এটুকুও ছেড়ে দেবেন এর পর। মমতাও প্রাইভেট টিউশনের পাট তুলে দিচ্ছেন ক্রমশ। আর অত হ্যাপা পোষায় না। বাড়িতে দু'টি মাত্র প্রাণী। গত ক'বছরে পেনসনের হার বেড়ে এখন প্রচুর টাকা পাচ্ছেন অবনী। এ ছাড়া জমানো টাকার সুদও রয়েছে। হেসে খেলে বাকী জীবনটা কেটে যাবে আর এক পয়সা রোজগার না করেও। অবশ্য শুধু টাকার জন্যেই এযাবৎ কোচিং ও টিউশনে লেগে থাকেননি এঁরা। একটা সার্থকতার অনুভূতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু বয়স বলেও একটা কথা আছে। সত্তরের কোঠায় এসে বাড়তি ধকল শরীরে আর সয় না।

কোচিং সেন্টার ও টিউশনি দিয়ে সময়টা ভরে থাকতো এত দিন। এখন হাতে সময় পাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে একটু এদিক সেদিক ঘুরে আসতে ভালই লাগে আজকাল। তাই ঠিক করলেন এবারকার গেট টুগেদারে উপস্থিত থাকবেন। পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসবেন তাদের মাঝে। এঁদের পুরোনো বন্ধু সচদেবরাও উপস্থিত থাকছে এবার। সচদেব অবনীর কোর্সমেট। জামনগরে একত্রে ছিলেন। মমতার সঙ্গে নিম্মি সচদেবের খুব ভাব হয়ে গেছিল জামনগরে থাকাকালে। আগে ভাগে অবসর নিয়ে সচদেব মরিসাস্ চলে গেছিলেন তাঁর ভগ্নিপতির ব্যবসায়ে ভাগীদার হয়ে। এখন দিল্লীতে শেখসরাইয়ে বাড়ি কিনে পাকাপাকি ভাবে এখানেই বসবাস করবেন মনস্থ করেছেন।

মিসেস সচদেব ফোনে ফোনে উত্ত্যক্ত করে তুললো মমতাকে - "কতদিন দেখা হয়নি। গেট টুগেদারে চুটিয়ে গল্প হবে। আসা চাই-ই।"

শেখসরাই নামটা শুনে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলেন অবনী। মমতারও মনে পড়ে গেল এক সময় ভারী আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল ছিল শেখসরাই। কতবার যে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সলোমনদের বাড়িতে ছুটির দিনে প্রায়ই যেতেন ওঁরা। সলোমনরা আসতো ওঁদের বাড়িতে মোতিবাগে। বছর দশেক ধরে সলোমনদের খোঁজ-খবর রাখেন না আর। এদের জগৎ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে গেছে তারা ----।

সলোমন পরিবারের সঙ্গে এঁদের দারুণ হৃদ্যতা ছিল একসময়। বিয়ের পর মমতা যখন এলাহাবাদে স্বামীর ঘর করতে এলেন, সলোমনরাও তখন এলাহাবাদে। পাশাপাশি বাড়ি। বার্বারাও বিয়ে হয়ে নতুন এসেছে। কেরালার মেয়ে। আহারে বিহারে মমতার সঙ্গে অনেক অমিল। কিন্তু মন তাদের এক সুরে বাঁধা। দু'জনেই সহজ সরল জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। বই পড়তে ভালবাসে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ইচ্ছে ছিল আরও অনেক পড়াশোনা করবে, নিজের কৃতিত্বে সাফল্য অর্জন করবে। কিন্তু রক্ষণশীল অভিভাবকরা মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়া মাত্র সুযোগ্য পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব চুকিয়ে ফেললেন। দু'জনেরই।

এলাহাবাদ থেকে সলোমন বদলি হল আগ্রায়। অবনী জয়পুরে। এর ক'মাস পরে বার্বারার মেয়ে জুলিয়ার জন্ম হল। তার কয়েক সপ্তাহ পরে মমতার কোলে এলো প্রশান্ত। সুদীর্ঘ তেরো বছর পর ব্যাঙ্গালোরে আবার একই অফিসে

বদলি হল সলোমন ও অবনী। সলোমনের তিনটি মেয়ে। অবনীর ঘরে তখনো প্রশান্ত একা। জুলিয়া ও প্রশান্ত একই ক্লাসে পড়ে। ছুটির দিনে কখনো সলোমন সপরিবারে অবনীদের বাড়িতে চলে আসে, কখনো অবনী মমতা ও প্রশান্তকে নিয়ে সলোমনদের ওখানে চলে যায়। আরও কয়েকজন সহকর্মী ও প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালমত পরিচয় ছিল, কিছুটা হৃদ্যতাও ছিল। কিন্তু মমতা ও বার্‌বারার সেই প্রথম পরিচয়ের যোগসূত্র যেন সময়ের সাথে আরও অটুট হয়েছে। আসলে ওরা দু'জনেই একটু অন্য ধরনের। স্বামীর অন্য সব সহকর্মীদের স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশায় কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যায়। লেডিজ ক্লাবে তম্বোলা ও গতানুগতিক যত মনোরঞ্জনের আয়োজন, পার্টিতে অভ্যাগতদের লঘু রসিকতা - হাস্য-পরিহাস এসবের মাঝে প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে। বাইরের সাজানো খুশি-খুশি চেহারাটা ধরে রাখতে প্রাণান্ত পরিশ্রম হয়।

আরও আট বছর পাঠানকোট, কানপুর ও নাসিকে কাটিয়ে যখন দিল্লীতে এলেন অবনী, সলোমন তার বছর তিনেক আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দিল্লীতে পাকাপাকি ভাবে বাস করছে। একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে সলোমন। মুখ্যতঃ সময় কাটাতেই। ব্যবসা মানে সাইবার ক্যাফে। ভদ্র পাড়ায় ঝকঝকে অফিসঘরে বসে মনোমত বইপত্তর পড়া ও সেই সঙ্গে খদ্দেরদের প্রতি একটু আধটু মনোযোগ দেওয়া। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ও অনেক প্রৌঢ় লোকেরাও সাইবার ক্যাফেতে এসে কম্প্যুটার নিয়ে বসে। তারপর কাজ হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে চলে যায়। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, পরিচ্ছন্ন ব্যবসা। জুলিয়া এম.এ. পড়ছে। ওর দুই বোন মার্গারেট ও ক্যাথারিণ এখনও স্কুলে। প্রশান্ত দিল্লীতে বি.এস.সি. পাশ করে কেটারিংএর কোর্স করছিল। অবনীরা দিল্লী আসার আগে সলোমন প্রশান্তর লোকাল গার্জেন ছিল। ছুটি-ছাটায় বাড়িতে ডাকতো প্রশান্তকে। বার্‌বারা ভাল-মন্দ রেঁধে খাওয়াতো। কোর্স শেষ করে দিল্লীরই একটা বড় হোটেলে চাকরি নিলো প্রশান্ত।

এরপর হঠাৎ দুই পরিবারের এতদিনের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল একটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে। জুলিয়া ও প্রশান্ত যে ছোটবেলা থেকে দু'জনে দু'জনের একাত্মা বন্ধু সে কথা সবাই জানতো। এত বছর পর জুলিয়ার বাবা-মা'র মনে হল প্রশান্তর মা-বাবার প্রশ্রয়ের দরুনই ওরা এতটা ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে। প্রশান্তর বাবা-মা'রও সেই একই ধারণা হল জুলিয়ার মা-বাবা সম্পর্কে।

দিল্লীতে আসার আগেই ভাসা ভাসা খবরটা কানে এসেছিল অবনীর যে সলোমন প্রশান্তকে তাদের বাড়ি যেতে নিষেধ করে দিয়েছে। জুলিয়া কলেজ ফাঁকি দিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করতো বলে জুলিয়ার কলেজে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে তারা। অবনী ও মমতা রাগে অপমানে স্তব্ধ হয়ে গেছিলেন এই সংবাদ শুনে। তাদের মতে জুলিয়ার বাবা-মা'ই এযাবৎ ক্রমাগত তাদের ছেলেকে হাতাবার চেষ্টা করেছে, উঠতি বয়সের মেয়েটাকে তার পিছনে লেলিয়ে দিয়ে। ভেবেছিলেন প্রশান্তকে দিল্লী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লীতে ডি.ডি.এ. ফ্ল্যাটের অ্যালট্‌মেন্ট এসে গেল। বড় একটা সুরাহা পেলেন। বাবা-মা কাছাকাছি থাকলে ছেলেটা কুপথে যেতে পারবে না। জুলিয়ার সঙ্গে প্রশান্তর মেলামেশাকে ওঁরাও কুনজরে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন।

সলোমন ও বার্‌বারা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওদের মাথায় ঢুকে গেছে যে প্রশান্ত জুলিয়ার জীবনে দুষ্টগ্রহের শামিল। তার হাত থেকে মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে তড়ি ঘড়ি তার বিয়ে পাকা করে ফেললেন। ওদের পরিচিত কারো আত্মীয় দুবাই'এ ব্যবসা করে। ধনাঢ্য পরিবার। সেখানেই জুলিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। ওদিকে অবনী ও মমতাও উঠে পড়ে প্রশান্তর জন্যে পাত্রী খুঁজতে লাগলেন এবং মাস দুয়েকের মধ্যে উত্তর বঙ্গের এক অবস্থাপন্ন উকীলের এক মাত্র কন্যা এবং এক মাত্র সন্তানের সঙ্গে প্রশান্তর বিয়ে হয়ে গেল। প্রশান্তর বয়স তখন বাইশ বছর। এর আগে তাদের পরিবারে ত্রিশের কোঠায় পা দেবার আগে ছেলের বিয়ের কথা উচ্চ-বাচ্য করতো না কেউ। প্রশান্ত নিজের বিয়ের ব্যাপারে হ্যাঁ - না কিছুই বলেনি। নিজেকে পুরোপুরি বাবা-মা'র হাতে সঁপে দিয়েছে। জুলিয়াকে কেন্দ্র করে তার প্রতি বাবা-মা'র অবিশ্বাস তাকে মর্মাহত করেছিল। চরম অভিমানে নিজেকে সে সম্‌পূর্ণভাবে গুটিয়ে নিয়েছিল।

প্রশান্তর বিয়ের পরিণাম ভাল হয়নি। উগ্রস্বভাবের অমার্জিত অশালীন দেমাকী মেয়েটিকে এখন যমের মত ভয় করেন তাঁরা। হাতে পায়ে ধরে তাকে অন্যত্র বাড়ি নিয়ে থাকতে রাজি করেছেন কোন মতে। যে ক'দিন - মোট মাস দুয়েক - ওঁদের সঙ্গে ছিল, সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতেন। বৌমার এ বাড়ির কোন কিছুই - ভাতের চাল থেকে বাথরুমের টাইল - বাপের বাড়ির সমতুল্য বলে মনে হত না। তার সব নিন্দা - বক্রোক্তি - অপমান মুখবুজে মেনে নিতে হত। তা না হলেই বৌমা ফোনে বাবাকে নালিশ করতো এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের হুমকি আসতো তার বাবার কাছ থেকে। এরপর যেদিন বেয়াই বললেন তাঁর মেয়েকে

বিন্দুমাত্র অসুখী করলে মেয়ের শাশুড়িকে ধরে আনবার জন্যে গুণ্ডার দল পাঠাবেন এবং সেই গুণ্ডাদের পরবর্তী কার্যক্রম অতি অশ্লীল ভাষায় অক্লেশে উচ্চারণ করলেন, এঁদের সহ্যের বাঁধ পুরোপুরি ভেঙে গেল। প্রশান্তকে বললেন তার বউকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। ইদানীং প্রশান্ত একেবারে নিশ্চুপ উদাসীন হয়ে গেছিল। দু'এক দিনের মধ্যে বউ নিয়ে চলে গেল কোন কথা না বলে।

এর কয়েক মাস পরে প্রশান্ত চাকরি নিয়ে কেনিয়া চলে গেল। একা। দু'বছর অন্তর আসে। বাবা-মা'র কাছে কাটিয়ে যায় কিছুদিন। প্রশান্তকে তার স্ত্রী সম্বন্ধে কোনদিন প্রশ্ন করেননি এঁরা। এই ভাবে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এবারও প্রশান্ত দেশে এসেছে দু'বছর পর। আপাতত বাবা-মা'র কাছেই আছে। কতদিনের ছুটি, বাবা-মা'র কাছে ছাড়া অন্য আর কোথায় ছুটি কাটাবে প্রশান্ত সে সম্বন্ধে এঁরা কিছুই জানেন না ----।

আজকাল একটা কথা প্রায়ই মনে হয় মমতার। আহা, জুলিয়া যদি তাঁদের পুত্রবধূ হত! প্রশান্ত আর জুলিয়াকে একসঙ্গে দেখে অনেক বছর আগে হঠাৎ এই কথাটাই মনে হয়েছিল একদিন। নিষিদ্ধ, আজগুবি বলে জোর করে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন চিন্তাটা। মমতার শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন তখন। এঁদের কাছে থাকতেন। ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালে একবার জুলিয়ার হাতে বার্‌বারা নিজেদের বাগানের পাকা পেঁপে পাঠিয়েছিল।

শাশুড়ি খেলেন না। বললেন, "ওরা গরু খায়, ওদের ছোঁয়া ফল খাবো না।"

প্রশান্ত ঠাকুমার সঙ্গে এই নিয়ে কত ঠাট্টা করলো, রাগারাগি করলো ----। শেষ অবধি সদ্ ব্রাহ্মণের মেয়েকে ঘরে এনেই বা কি সুখ পেলেন তাঁরা? ছেলেটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। বিদেশে বিভূঁইয়ে পড়ে আছে শুধু ওই অভদ্র কটুভাষিণী বউকে এড়ানোর জন্যে। নিশ্চয় নিয়মিত মোটা টাকা খেসারত পাঠায় যাতে ওকে তারা একটু শান্তিতে থাকতে দেয়, ওর বাবা-মা'কে প্রতিনিয়ত পুলিস ও গুণ্ডার হুমকি দিয়ে উত্ত্যক্ত না করে।

আটটায় ডিনার। সাতটা থেকে গেস্টদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটার মধ্যে তেরোজন সদস্য এসে গেছে - ন'জন সস্ত্রীক। বাকি চারজনের মধ্যে দু'জন মৃতদার, অন্য দু'জনের স্ত্রী কোন কারণবশত আসতে পারেনি। আজকের পার্টিতে সকলেই গেস্ট, আবার সকলেই হোস্ট। সবাই মিলে চাঁদা তুলে

গেট টুগেদারের আয়োজন হয়েছে। প্রতিবার যেমন হয়।

অবনী সান্যাল ও মমতা একটু সকাল সকাল বেরিয়েছিলেন হাতে সময় নিয়ে। গোটা তিনেক ট্র্যাফিক লাইট ও একটা ট্র্যাফিক জ্যামে খানিকক্ষণ আটকে পড়লেন। তবু, খুব একটা দেরীতে পৌঁছননি ওঁরা। সচ্‌দেবরা আরও পরে এলো। অবনী সান্যাল ও মমতা ততক্ষণে সমাগত সকলের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় করে বসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সচদেবরা এলো। হাসিমুখে সবাইকে 'হ্যালো' বলতে বলতে নিম্মি সচ্‌দেব মমতার কাছে এসে তার পাশটিতে বসে পড়লো। দু'জনে দু'জনের হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো মমতার মনে। হয়তো সলোমনরা এদের বলেছে অবনী সান্যালের ছেলেটা চরিত্রহীন লম্পট। তাকে তাদের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে মানা করে দিয়েছে তারা। মমতার মাথাটা দপ-দপ করতে লাগলো, রাগে দুঃখে অপমানে। সেই সঙ্গে ভয়েও। সত্যিই যদি এই সব কথা নিম্মি সচ্‌দেব শুনে থাকে সলোমনদের কাছে? শেষ অবধি সলোমনদের বিষয় কোন প্রশ্ন না করাই নিরাপদ মনে হল মমতার। সচ্‌দেব, অবনী সান্যাল ও সলোমন -- তিনজনের একসঙ্গে এক জায়গায় পোস্টিং হয়নি কখনো। এই দুই পরিবারের অনবদ্য বন্ধুত্বের বিষয় সচদেবদের জানার কথা নয়। ওরা শুধু জানে সলোমনদের সাথে চেনাশোনা আছে এদের। সে তো কত লোকের সাথেই থাকে। তাই বলে পার্টিতে এসে জনে জনে সবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

হলের অন্য দিকে অবনী সান্যাল সোফায় বসে গল্পগুজব করছেন। পাশে সচ্‌দেব বসে আছে। সচ্‌দেব পকেট থেকে একটা কিছু (ভিজিটিং কার্ড কি?) বার করে অবনী সান্যালের হাতে ধরিয়ে দিল। অবনী সান্যাল সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মমতা তখন অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। নিম্মি সচ্‌দেব উঠে অন্য একটা সোফায় গিয়ে বসেছে আরও অন্য মহিলাদের সাথে। এটাই নিয়ম। পার্টিতে অতজনের মাঝে অন্তরঙ্গ এক জনের সঙ্গে একনাগাড়ে বসে থাকা অন্য সবাইকে অগ্রাহ্য করে - সেটা রীতিবিরুদ্ধ। অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে।

বাক্যালাপের ফাঁকে ফাঁকে মমতা দরজার দিকে নজর রাখলেন স্বামীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। অনেকক্ষণ কেটে গেল। বাইরে গিয়ে একবার দেখে আসবেন?

শরীর-টরীর খারাপ হয়ে থাকে যদি? কিন্তু যাবার সময় তো বেশ চট্‌পট্‌ উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হাঁটা চলার ভঙ্গী একেবারেই স্বাভাবিক। বোধহয় কাউকে ফোন করতে গেলেন। ফোন করে ফেরার মুখে হয়তো চেনা-পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে হোটেলের করিডোরে। কারো জন্মদিন কি বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আসা কোন অতিথি যাকে অনেক কাল আগে চিনতেন। চাকরি জীবনের বাইরের কোন বন্ধু। বড় হোটেল। একাধিক ব্যাঙ্কোয়েট হল আছে এখানে। ছোট ছোট অন্তরঙ্গ পার্টির জন্যে ছোট কামরাও আছে কয়েকটা।

মমতা দরজার দিকে খেয়াল রেখে হালকা গলায় কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার কাঁটা খচ্‌খচ করতে লাগলো। উঠে গিয়ে একটু দেখে আসবেন সেটুকু আস্থা নেই নিজের উপর। হাঁটা চলা করতে রীতিমত কষ্ট হয় আজকাল। তাছাড়া এত বড় জায়গা, কোথায় খুঁজতে যাবেন? অবনী সান্যালের কোর্সমেট ও তাদের গিন্নীরা যদি টের পায় উনি স্বামীর জন্যে দুশ্চিন্তা করছেন হাস্য পরিহাসের খোরাক হবে ব্যাপারটা।

টেবিলে খাবার পরিবেশন করে গেছে। বুফে সিস্‌টেম। প্লেটে খাবার নিয়ে সবাই যেখানে খুশি এসে বসছে আবার। বয়সকালে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে খেতো অনেকে। তাতে এক সঙ্গে অনেকের কাছাকাছি হওয়া যায়। সোফা বা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চেয়ারে বসলে সে সুযোগ থাকে না। গেট টুগেদারে যতজন এসেছে সকলের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা বাঞ্ছনীয়। যাতে কেউ না বলতে পারে, "পার্টিতে অমুক আমায় চিনতেই পারলো না" কিংবা "অমুক একবার কুশল প্রশ্নও শুধোলো না।" ফর্মাল পার্টিতে অনেক হ্যাপা। তবু তো এদের গেট টুগেদারে বয়সের কথা বিবেচনা করে অনেক নিয়ম কানুনই মানছে না এরা।

বেশীর ভাগ লোকে যখন সেকেণ্ড হেল্‌পিং নিয়ে সেটুকুও শেষ করে ফেলেছে, এবার সুইট ডিশ নিতে যাবে তেমন সময় অবনী সান্যাল ফিরে এলেন। চোখ মুখের চেহারা বিধ্বস্ত। ঘরে ঢুকেই অবশ্য মুখখানা হাসি হাসি করে ফেললেন আবার। খাবার টেবিলে এসে প্লেট তুলে নিলেন। তারপর এলোপাতাড়ি খাবার তুলে নিলেন নামমাত্র পরিমানে। মমতার মন তার হাসি মুখের আড়ালে দারুণ দুশ্চিন্তায় ভরে গেল।

ট্যাক্সিতে সারা রাস্তা দু'জনে নীরবে এলেন। বাড়ি এসে নিঃশব্দে ডুপ্লিকেট চাবি

দিয়ে দরজা খুললেন। বসার ঘরে দেয়াল ঘড়িতে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজলো নীচু সুরেলা আওয়াজে। টেবিলে প্রশান্তর জন্যে খাবার ঢাকা দিয়ে গেছিলেন মমতা। ঢাকা খুলে দেখলেন অল্প একটু ভাত, ডাল ও বাঁধাকপির তরকারী খেয়েছে ছেলেটা। আলু-পোস্ত কিংবা মাশরুম এ দুটোর একটাও স্পর্শ করেনি। মমতার বুকটা হু হু করে উঠলো। একসময় এ দুটো পদের যে কোন একটা খাবারটেবিলে দেখলে আনন্দে সোচ্চার হয়ে উঠতো প্রশান্ত। পছন্দসই খাবার পেয়ে অত বড় ছেলের আহ্লাদে আটখানা হওয়া দেখে মজা লাগতো তাঁদের। সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। আজও সে সব ঘটনা পরিষ্কার মনে পড়ে মমতার।

দিল্লীতে পৌঁছেই ছেলেকে তলব করেছিলেন অবনী সান্যাল। প্রশান্ত নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। প্রাক্তন দুই সহপাঠীর সঙ্গে ঘর ভাড়া করে থাকে। বাবা-মা এসে পড়ায় তল্পি-তল্পা সমেত বাড়ি চলে এলো যদিও পুরোমাসের ঘর ভাড়া দেওয়া ছিল, আরও দু'হপ্তা থাকতে পারতো সেখানে। বাবা-মা প্রথম দর্শনেই জুলিয়ার ব্যাপার নিয়ে পড়লেন। সলোমন ওকে তাদের বাড়িতে যেতে মানা করে ওর বাবা-মা'কে কি নিদারুণ অপমান করেছে সেই কথা তুললেন। আশ্চর্য, প্রশান্তর হাবে ভাবে অপরাধীসুলভ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে নিজেও ভারী অবাক হয়ে গেছে তার সলোমন আঙ্কলের এই অদ্ভুত আচরণে। এরপর অবনী যখন বললেন যে তাঁরাও চান না জুলিয়া প্রশান্তর সঙ্গে কোনভাবে যোগাযোগ রাখুক, প্রশান্তর বিস্ময় আর বাধা মানলো না।

"বাবা! মা! কি বলছো তোমরা? জুলিয়া এলে চলে যেতে বলবো! বলবো যে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই না! হঠাৎ তোমাদের কি হল বলো তো? এরকম অদ্ভুত কথা কেন বলছো? কেন?"

অবনী ও মমতা রাগে অপমানে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন সেদিন। প্রশান্ত যে নির্দোষ, সে এমন কোন কাজ করেনি যাতে তার বাবা-মা'কে তিলমাত্র লজ্জিত হতে হয় তার সেদিনকার ব্যবহারেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছিল। কিন্তু তাদের ক্রোধান্ধ হৃদয় তখন নিজেদের অপমানের প্রতিকার ও প্রতিশোধের চিন্তায় ব্যস্ত। হায় হায়, শেষে নিজের একমাত্র সন্তানের সুখ-শান্তি-ভবিষ্যৎ, নিজেদের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি সমস্ত কিছু প্রতিহিংসার জঠরে ঠেলে দিলেন। নিজেদের স্তোক দিলেন কর্তব্য পালন করছেন বলে। আজীবন সেই ভুলের দায় বয়ে বেড়াতে হবে তাঁদের।

মমতা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে টেবিল থেকে খাবারগুলো ফ্রিজে তুলে রাখলেন এক এক করে। অবনী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

"শুতে যাবে না?"

"আজ আর ঘুম আসবে না। এক কাপ কফি দাও বরং।"

দোতলা বাড়ি। নীচে হলঘর, স্টাডিরুম, রান্নাঘর ও একটা বেডরুম। বেডরুমের পাশে বাথরুম। দোতলায় দু'খানা বেডরুম, দুটো বাথরুম, প্রশস্ত বারান্দা ও এক ফালি ছাদ। নীচের বেডরুমটায় এখন প্রশান্ত থাকে। এদের বেডরুম দোতলায়।

মমতা রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানালেন। দুটো বড় কফি-মগে ধূমায়িত কফি এনে স্বামীকে দিলেন। নিজে নিলেন।

চেয়ার টেনে বসে বললেন, "পার্টি ছেড়ে অতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

অবনী সান্যাল বিচলিত স্বরে বললেন, "মানুষের জীবনে কত কি যে ঘটে যায়! জানো, সলোমন সচ্‌দেবকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল ওকে যেন একবার অতি অবশ্য ফোন করি, দরকারী কথা আছে। সচ্‌দেব মনে হল পুরো ব্যাপারটা জানে না। যা হোক সলোমনকে ফোন করতেই সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললো ওর ভ্রষ্টবুদ্ধির দরুন ওদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদেরও অকারণ অপমান করেছে। প্রশান্তর মত এমন ভদ্র শুভবুদ্ধি -সম্পন্ন ছেলে ও আর কখনো দেখেনি। হলফ করে বললো প্রশান্তর ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দোষণীয় কিছু পায়নি কোনদিন।

"ওর এবং বার্‌বারার হঠাৎ মাথায় ঢুকে গেছিল যে জুলিয়া ও প্রশান্তর আশৈশবের বন্ধুত্বটা লোকে কুনজরে দেখছে। বয়সের সঙ্গে যে যৌবন সচেতনতা আসে জুলিয়া ও প্রশান্তর মধ্যে তার কোনও প্রকাশ ছিল না। ওদের দেখে মনে হত পিঠোপিঠি দুই ভাইবোন। সলোমন যখন জুলিয়াকে প্রশান্তর সঙ্গে মেলামেশা করতে মানা করলো, জুলিয়াও প্রশান্তর মতই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল 'কেন বাবা কেন? হঠাৎ এরকম কথা বলছো কেন?' পরে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। সব ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চেষ্ট নিরুৎসুক হয়ে গেছিল।

"দুবাইয়ে এক অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে হয়েছিল জুলিয়ার। কিন্তু ছেলেটি বর্বর, পিশাচ। জুলিয়াকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। জুলিয়া বাবা-মা'কে কিছুই জানায়নি। সামাজিক বাধ্যবাধকতার বাইরে বাবা-মা'র সঙ্গে কোন যোগাযোগ

রাখেনি আর।" অবনী হাত দিয়ে চোখ মুছে বলতে লাগলেন, "শেষে একদিন জুলিয়াকে এমন মার-ধোর করলো যে জুলিয়ার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গেল। জুলিয়ার শাশুড়ি সলোমনকে ফোন করে বললেন মেয়েকে নিয়ে যেতে। সলোমন দুবাই গিয়ে জুলিয়াকে নিয়ে এলো। ওর স্বামী বলেছে জুলিয়া যেন আর কোনদিন তার কাছে ফিরে না যায়। তার জীবনে জুলিয়ার কোন স্থান নেই।

"আট বছর আগে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের। আট-ন'মাসের মধ্যে সব চুকে-বুকে গেল। জুলিয়া অর্ধমৃতের মত কাটিয়েছে এতগুলো বছর। কারো সঙ্গে কথা বলে না। শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছিল। চাকরি, পড়াশোনা কোন কিছু করার শক্তি ছিল না আর। মনটা একেবারেই মরে গেছে তার। ---- ভগবান যেমন সৌভাগ্যের ডালি উজাড় করে দান করেন, দুর্ভাগ্যের বেলাতেও অকৃপণ হাতে দেন। দু'বছর আগে জুলিয়ার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। পরপর তিনবার অপারেশন হয়েছে, কেমো ও রেডিয়েশন হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এক অঙ্গ কেটে বাদ দিলে রোগ অন্য অঙ্গে হানা দেয়। এখন টারমিনাল স্টেজ। আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র আয়ু জুলিয়ার ----।"

অবনী কথা বলছিলেন আর বারবার চোখের জল মুছছিলেন। মমতার দু'চোখ বেয়ে অবিরল জলের ধারা নেমে আসছে।

"সলোমন ও বার্‌বারা আমাদের দু'জনের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। জুলিয়ার শেষ কটা দিন তাকে আগলে নিয়ে বসে আছে তারা। সে চলে যাবার পর ওরা পায়ে ধরে আমাদের ক্ষমা ভিক্ষা করতে আসবে।"

অবনীর শেষ কথাগুলো কান্নার আবেগে ডুবে গেল। মমতা আর সহ্য করতে পারলেন না। ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপরেই হাত দিয়ে নিজের মুখখানা সজোরে চেপে ধরলেন। মনে পড়লো ও ঘরে প্রশান্ত ঘুমিয়ে আছে। ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

খানিক বাদে দোতলায় গিয়ে বিছানা ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়লেন দু'জনে। ঘুম নেই তবু চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর মমতা নিঃশব্দে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। ডাইনিং রুমের দেয়াল ঘড়িতে তিনটে বেজেছে। প্রশান্তের দরজার সামনে এসে দু'এক মুহূর্ত কিছু চিন্তা করলেন। তারপর পর্দা সরিয়ে মাথা গলিয়ে দেখলেন। বাইরে গেটের কাছে লাইট জ্বলে রাতভোর। জানলা দিয়ে আলোর রেশ এসে ঘরে যেন একটা অপার্থিব আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। সেই

আধো-অন্ধকারে মমতা দেখলেন প্রশান্ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার তোড়ে তার কাঁধ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনেকক্ষণ ধরে ছেলের কান্না দেখলেন মমতা। তারপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে সরে এলেন।